# বাইবেল একটি - খ্রীষ্টমণ্ডলী অনেক, কেন ?

*লেখক : ডেনীস গিলেট*
*ভাষান্তর : অনিরুদ্ধ দাশ দীপক*

---

*আমাদের সময়টা বড় চ্যালেঞ্জস্বরূপ।*
*অন্তত এব্যাপারে সকলের একমত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া খুবই সংবেদনশীল যে -*
*বাইবেল একটাই।*

আমরা কি এবিষয়ে সম্পূর্ণ একমত ? নিশ্চিতভাবে বর্তমানে বহু ধরনের অনুবাদ বা ভার্ষন (বহু প্রকাশকের সম্পাদনা ও প্রকাশনা) রয়েছে- কিন্তু বাইবেল অবশ্যই একটা। অনুবাদের ভাষা হতে পারে বিভিন্ন, যেমন পূর্বদেশীয় বা পশ্চিমা, প্রাচীন কালের কিংবা আধুনিক ভাষা তাতে কিছু এসে যায় না। তবে কখনই অনুবাদের ক্ষেত্রে কারো অমুক বিষয়ে, কারো তমুক বিষয়ে পরিবর্তন আনার কোন এখতিয়ার বা সুযোগ নাই। কারণ হাজারো বাইবেল পন্ডিত বা বিশেষজ্ঞ রয়েছেন যারা প্রতিনিয়ত এমন হস্তক্ষেপ বা পরিবর্তনের বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখছেন। সামান্য কোন শব্দ বা বাক্যের মধ্যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আসলেই হাজারো মানুষের কলম তার বিপক্ষে অবস্থান নেবার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এসব কারণে বাইবেল অপূর্ব একটি গ্রন্থ। খুব বাস্তব ও সঠিক অর্থেই ইউনিক / একক বা অপূর্ব এই বাইবেল। প্রায় প্রতিটি জাতির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য এবং বাইবেলের একত্ব বা একক অবস্থা এ সব জাতিগোষ্ঠির মধ্যেই একরকম। অনেক ধর্ম রয়েছে সেগুলির কিছু কিছু বিষয় মনে হয় যে সমানভাবে স্পষ্টত একরকম। অনেক লোক আছেন যারা বলেন, ধর্মের অনেক নাম থাকলেও আসলে সকল ধর্মই এক। আসলে ধর্মের পার্থক্যকে লুকানোর জন্য এটা এক ধরনের মানুষের মৌখিক বুলিমাত্র। বাস্তবে বিভিন্ন ধর্মের নাম সৃষ্টি হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পার্থক্য থাকার কারণেই। সত্যি কথা বলতে কি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিশ্চয় কিছু অভিন্নতা রয়েছে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বিভিন্ন ধর্মের মাঝে পার্থক্য প্রচুর। একধর্ম থেকে অন্য ধর্মের শিক্ষার পার্থক্য রয়েছে, ঠিক তেমনি খ্রীষ্টধর্মের মধ্যেও এক চার্চের শিক্ষা থেকে অন্য চার্চের শিক্ষারও পার্থক্য রয়েছে। এসব পার্থক্য প্রকৃত অর্থেই বাস্তব ও মৌলিক। আবার এমন অনেক মতবাদগত ধর্ম ও খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী রয়েছে যাদের নিজেদের ধারনা ও ব্যবহারিক চর্চার ক্ষেত্রে একে অন্যের মাঝে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেকোন ক্ষেত্রেই এই বৈপরীত্যের বাস্তব বহিঃ প্রকাশ সংশিষ্ট লোকদের মুখের কথা থেকেই প্রকাশ পায়। অনেক মানুষ যারা নিজেদের বৃত্তের মধ্যেই সত্যধর্মকে খুজে ফিরছেন তারা নিজেদের মধ্যে বিভ্রান্তির জট পাকিয়ে ফেলেন ও অবশেষে কিংকতর্ব্যবিমূঢ়

অবস্থায় পড়েন। ঠিক তেমনি খ্রীষ্টিয়ানরাও যখন দেখেন তাদের সামনে একটি মাত্র বাইবেল অথচ চারিদিকে বহু চার্চের ছড়াছড়ি তখন তারা খুব অসহায় অবস্থায় পড়েন ও অবশেষে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না যে, কোন দিকে যাবেন। খ্রীষ্টিয়ানদের ক্ষেত্রেই এই বহু বা বিভক্তীর জটিল সমস্যাটি আরও বিভ্রান্তিযুক্ত হয়ে ওঠে যখন ভিন্ন ভিন্ন সব চার্চই দাবী করে যে তাদের শিক্ষাগুলিই বাস্তবে বাইবেল ভিত্তিক - এবং সেটি এই একক বাইবেল থেকেই। কিন্তু এমন অদ্ভুত পরিস্থিতিটার উদ্ভব হল কিভাবে ?

## পার্থক্য বা ভিন্নতার সুচনা

প্রটেষ্ট্যান্ট সংস্কারকরা যখন ঐসময়কার চার্চের অনেক বিষয়ে প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করেন এবং এর পর পরই রোম মণ্ডলী থেকে পৃথক হয়ে বেরিয়ে আসেন তখন তাদের এই আন্দোলনের কেন্দ্রিয় আবেদনটি ছিল, "বাইবেল, একমাত্র সমগ্র বাইবেল এবং বাইবেল ছাড়া আর কিছুই নাই"। তাদের এই আবেদনের পেছনে যে গভীর উদ্দেশ্যটি ছিল তাহচ্ছে, মানুষ যখন নিজে বাইবেল পড়বে, তখন তারা নিজেরাই ঈশ্বরের প্রকৃত সত্যগুলি জানতে পারবে, ঈশ্বরের আসল উদ্দেশ্য কি তা বুঝতে পারবে, তাদের পুরাতন ভুল-ত্রুটিগুলো ধরতে পারবে এবং এর ফলশ্রুতিতে তারা বাইবেল নির্দেশিত এক বিশ্বাসে একতাবদ্ধ হতে চেষ্টা করবে।

এই প্রটেষ্ট্যান্ট আন্দোলনের যে মূল মতবাদ তার অন্যতম দুঃখজনক দিক হচ্ছে, তাদের তত্ত্ব কথাগুলি বাস্তবে প্রয়োগ সম্ভব হয়নি। প্রটেষ্ট্যান্ট আন্দোলনের মূল নেতা যে খ্রীষ্টিয় একতা আশা করছিলেন, একটা সময় পর সেটি ভিন্ন ভিন্ন মতামতের মাঝে একতার বিষয়টি নিশ্চিত করে এবং সময়ের সাথে সাথে বেশকিছু উল্যেখযোগ্য খ্রীষ্টিয় মতবাদের মণ্ডলী ক্রমশ তাদের নিজস্ব মতামত বা ধারনা বাইবেলের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বলে দাবী করতে থাকে, যার ফলশ্রুতিতে ক্রমশ বিবদমান চার্চগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব আরও ছড়িয়ে পড়তে থাকে ও ক্রমশ বিসৃংখল রূপ ধারন করে। বর্তমান আধুনিক একিউমেনিক্যাল আন্দোলনের সচেতনতা বৃদ্ধির অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে যে, বর্তমান খ্রীষ্টধর্মের সর্বাপেক্ষা বিড়ম্বনাটি হচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বহু'বা বিভক্ত খ্রীষ্টমণ্ডলীর সরব উপস্থিতি। একই রকম ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা ব্যক্তি পছন্দের ব্যাপারটি, যা প্রটেষ্ট্যান্ট আন্দোলনের মৌলিক বিষয় ছিল, সেটাই মুলত একতার মূলভাবকে দুর্বল করে ফেলেছে। তবে মোটামুটি একথা সত্য যে, একটি মাত্র বাইবেলকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা যা যুগ যুগ ধরে প্রটেষ্ট্যান্ট মণ্ডলীর সদস্যরাই নিজেদের মাঝে সেই পার্থক্য বা ভিন্নতা জিইয়ে রেখেছেন।

তাহলে মণ্ডলীর সংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্য কি ভূল ছিল ? তাদের ধারনা কি এটা ছিল যে বাইবেলের সকল শিক্ষাই সবদিকদিয়ে যথেষ্ট ছিল ? এবং মানুষের প্রখর অনুভূতি ও শুভইচ্ছা বাস্তবেই স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান অথবা ভূল ? অথচ বাস্তব অবস্থাটা হচ্ছে, যেরকম ফলাফল আশা করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক কম পাওয়া গিয়েছে, তবে তার দ্বারা কখনই এটি বোঝানো যায় না যে, তাদের উদ্দেশ্য কোন না কোন দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ ছিল। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, অন্যান্য যেসব উপাদান বা বিষয়ছিল যেগুলি ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের মণ্ডলীর মাঝে বাস্তব একতা গঠনের কাজগুলি সংক্ষিপ্ত কিংবা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বাইবেল সবসময় এর নিজের শিক্ষা সম্পর্কে দাবী করে আসছে যে, এর শিক্ষা সর্ববিষয় সম্পর্কিত ও সর্বক্ষেত্রে পূর্নাঙ্গ। ঈশ্বর মানুষের কাছে কথা বলেন। বাইবেলই দাবী করছে যে, যুগ যুগ ধরে ঈশ্বর তাঁর বহু পবিত্র ব্যক্তি বা ভাববাদীদের মধ্যে দিয়ে কথা বলে এসেছেন এবং এই শেষকালে তাঁর আপন পুত্র প্রভু যীশুর মধ্যে দিয়ে সমস্ত কথা বলেছেন। ঈশ্বর তাঁর পবিত্র লোকদের মাধ্যমে ও আপন পুত্র যীশুর মধ্যে দিয়ে কি কি কথা প্রকাশ করেছেন তা বাইবেলের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লিখিত রয়েছে। বাইবেল মানুষের কাছ থেকে একেবারে নিয়ে নিলে দেখা যাবে, ঈশ্বর যে নীরব, নিশ্চুপ। আবার অনেক ধার্মিক ব্যক্তি বলে থাকেন যে, তিনি দর্শন পেয়েছেন এবং ঈশ্বরের বিশেষ নির্দেশনা লাভ করেছেন, যা বাইবেল থেকে আলাদা বা বাইবেলের বাইরে। এটি সংখ্যায় খুবই নগন্য, কিন্তু বাকী সিংহভাগ নারী ও পুরুষ এধরনের কোন চিহ্ন দেখাতে পারেন না কিংবা স্বর্গ থেকে তাদের জন্য কোন নির্দেশনা থাকে না। আসলে সেই আদি থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পবিত্র শাস্ত্রের মধ্যে লেখা ঈশ্বরের বাক্যই মূলত স্বর্গীয় নির্দেশনা বা স্বর্গের কথা।

বাইবেলের সর্ব-সম্পূর্ণতা বাইবেল নিজেই সাক্ষ্য দেয়। যীশু তাঁর এই জগতে থাকাকালিন সময়ে প্রায়ই তাঁর নিজের লোকদের ভৎর্সনা করেছেন, কখনই পবিত্র শাস্ত্র পড়ার জন্য ভৎর্সনা করেননি, কিন্তু পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করে সেই অনুসারে কেন কাজ করছেন না সে কারণে ভৎর্সনা করেছেন। তিনি বলেছেন :

> *"তোমরা শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া থাক, কারণ তোমরা মনে করিয়া থাক যে, তাহাতেই তোমাদের অনন্ত জীবন রহিয়াছে; আর তাহাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়; আর তোমরা জীবন পাইবার নিমিত্ত আমার নিকটে আসিতে ইচ্ছা কর না"* (যোহন ৫ঃ৩৯-৪০)।

সদ্দুকীদের কাছে পুনরুত্থান সম্পর্কে তাদের মনোভাব নিয়ে কথা বলেন, *"তোমরা ভ্রান্ত হইতেছ, কারণ তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম"* (মথি ২২ঃ২৯)। এর পর আরও বললেন, *"কিন্তু মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়ে ঈশ্বর তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি তোমরা পাঠ কর নাই? তিনি বলেন, 'আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর, ও যাকোবের ঈশ্বর'; ঈশ্বর মৃতদের ঈশ্বর নহেন, কিন্তু জীবিতদের"* (মথি ২২ঃ৩১-৩২)।

তৎকালিন প্রজন্মের লোকদের কাছে যীশু যে সব কথা বলেছেন সেগুলি ঈশ্বরেরই কথা, যেন ঈশ্বরই সরাসরি কথা বলছেন এবং এই কারণেই যারা শুনেছে তার ধ্বংস হয়ে যাবার ভয়ে তার কথা পালন করেননি।

## পবিত্র শাস্ত্র

প্রভুর পরিচর্য্যা কাজের ক্ষেত্রে প্রেরিত পৌলের একজন ঘনিষ্ট সাথী ছিলেন। নাম তার তীমথিয়, যিনি লুস্ত্রা থেকে আসা এক যিহুদী মহিলার ছেলে ছিলেন। এই যুবক সঙ্গীটি পৌলের দুটি চিঠি পেয়েছিলেন, যার একটিতে পৌল তার উদ্দেশ্যে লিখেছেন -

> *"তুমি শিশুকাল অবধি পবিত্র শাস্ত্রকলাপ জ্ঞাত আছ, সেই সকল খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা তোমাকে পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞানবান করিতে পারে"* (২য় তীমথিয় ৩ঃ১৫)।

তীমথিয়কে লেখা এই চিঠি থেকে আমরা দেখতে পাই যে পবিত্র শাস্ত্র সম্পর্কে তার পূর্ব ধারনা ছিল কত বেশি : তার মা ও দিদিমার কাছ থেকে তিনি এই শিক্ষা লাভ করেছেন। প্রেরিত ১৭ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পৌল ও শীল বিরয়া নগরীতে কিভাবে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। বিরয়ার লোকেরা খুব সন্তুষ্টচিত্তে তার কথা গ্রহণ করলেন, এবং পৌল ও শীল যা বলেছিলেন সেগুলির প্রমান তারা পেয়েছিলেন।

> *"থিষলনীকীর যিহূদীদের অপেক্ষা ইহারা ভদ্র ছিল; কেননা ইহারা সম্পূর্ণ আগ্রহপূর্বক বাক্য গ্রহণ করিল, আর এই সকল বাস্তবিকই এইরূপ কি না, তাহা জানিবার জন্য প্রতিদিন শাস্ত্র পরীক্ষা করিতে লাগিল"* (প্রেরিত ১৭ঃ১১)।

তাদের কাছে বলা পৌলের কথা শাস্ত্রসম্মত ছিল কিনা তা যাচাই করার জন্য তারা যে শাস্ত্র পড়াশুনা করেছিল সে ব্যাপারে পৌল তাদেরকে কোন তিরস্কার করেননি, বরং তিনি তাৎক্ষনিকভাবে এজন্য প্রসংশা করেছিলেন। থিষলনীকীয়ের আর একটু সমালোচনামুখর বিশ্বাসীদের কাছে তিনি ঠিক একইরকমভাবে বলেছিলেন *"সর্ববিষয়ে পরীক্ষা কর, যাহা ভাল, তাহা ধরিয়া রাখ"* (১ম থিষলনীকীয় ৫ঃ২১)।

বাইবেলের এসব পদগুলো এই বাস্তবতার উপর গুরুত্ব দেয় যে, ঈশ্বরের পরিত্রাণ ও সঠিক বিষয়গুলি তুলে ধরা ও সাধারন মানুষরা যাতে বাইবেল পড়ে ভালোভাবে বুঝতে পারে - এসব বিষয়ে ঈশ্বরীয় সত্যের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষমতাবান। বাস্তবভাবেই এটা সম্পূর্ণ সঠিক যে, যেসব বিশ্বাসী "পবিত্র শাস্ত্রের বিকৃতি ঘটায়" এবং বাইবেল যা বোঝাতে চায় তেমন অর্থ প্রকাশ করতে চেষ্টা করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবানী উচ্চারন করেছেন।

*"অতএব তোমরা সমস্ত দুষ্টতা ও সমস্ত ছল এবং কপটতা ও মাৎসর্য্য ও সমস্ত পরিবাদ ত্যাগ করিয়া, নবজাত শিশুদের ন্যায় সেই পারমার্থিক অমিশ্রিত দুগ্ধের লালসা কর, যেন তাহার গুণে পরিত্রাণের জন্য বৃদ্ধি পাও"* (১ম পিতর ২ঃ১-২)।

তাদের আত্মিক বৃদ্ধি ও বর্ধিষ্ণু ঈশ্বরের জ্ঞান আহরনের ব্যাপারটি নির্ভর করত প্রতিদিন অতি যত্নের সাথে ঈশ্বরের সত্য বাক্য পড়াশুনা করতেন। খুব সাধারন একটা পরামর্শ এক্ষেত্রে থাকতে পারে যে, নিজেরা নিজেরা এমন অধ্যায়ন করতে গেলে বিপদজ্জনক কোন বিষয় উঠে আসতে পারে অথবা এই অধ্যায়ন তাদেরকে আরও গভীর বিশ্বাস তৈরীর পথে নিয়ে যেতে পারে। তবে এইসব মতপার্থক্য থাকা সত্বেও ঐসব পদগুলোর অনিবার্য ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা হচ্ছে যে, পরিত্রাণ সম্পর্কে শিক্ষা দেবার জন্য পবিত্র শাস্ত্রের সম্পূর্ণ সক্ষমতা রয়েছে এবং এই সত্যটি সাধারন মানুষের বোঝার জন্য যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ। তাহলে বাইবেল অনুসারে প্রটেষ্ট্যান্ট সংস্কারকদের উদ্দেশ্যে একেবারে সঠিক ছিল, কিন্তু তাদের বাস্তব কাজে কিছু ভূল হয়েছিল।

## অনেক অনেক মণ্ডলী

কোন কিছু গোপন করার কোন উদ্দেশ্য বাইবেলের নেই, বরং প্রকাশ করে দিতে চায় সবকিছু। কোন প্রকার বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা নয়, কিন্তু একতা গঠন করাই বাইবেলের কাজ। আমরা এটা ভেবে অবাক হই যে, কেমন করে এটা ঘটতে পারে যে, বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির নিজস্ব ভাষায় বাইবেল অনুবাদ হবার পর থেকে, এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার যুগ শুরু হবার পর থেকে এতবেশি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মণ্ডলীর সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী চার্চগুলোর মধ্যে আজকে এত বিসৃংখলা বা মতবিরোধ চলছে।

প্রধানত দুটি নিয়ামক বিষয় এই ধরনের দুঃখজনক ফলাফলের সৃষ্টি হয়েছে: প্রথমত: বাইবেলকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে খোলা মন নিয়ে এর কাছে আসতে হবে (পড়তে), এর সব শিক্ষা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং এর শিক্ষাঅনুসারে জীবন পরিচালনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে সমস্যার বিষয়টি হচ্ছে, যত লোক এই বাইবেলের কাছে এসেছে তাদের অনেকেই এই সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হয়েছে যে তারা কি বিশ্বাস করে, অন্যান্য উৎস হতে ইতিমধ্যেই যে মতবাদগত বিশ্বাস তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল তারই সমর্থনে তারা বাইবেলের পদগুলিকে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে থাকে। সবসময়ই মানুষের মধ্যে একটা সাধারন প্রবনতা দেখা যায় যে, সে নিজের প্রতিমুর্ত্তিতে ঈশ্বরের প্রতিমুর্ত্তিকে একত্র করে দেখতে চায় - তাদের নিজেদের ইচ্ছার সাথে ঈশ্বরের আকাংক্ষাকে সাজিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করে। সুতরাং এভাবে তারা এমন একজন ঈশ্বরকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে, যিনি তাদের কাছে তাদের ইচ্ছার মত ঈশ্বর হয়ে থাকবেন। বাইবেল যে ঈশ্বরকে প্রকাশ করে, কখনই সেই প্রকৃত ঈশ্বর যেন নিজেরা না হই। তারা যে ঈশ্বরকে চেনে সেই ঈশ্বরকে বাইবেলের মধ্যে খুজে পাবার জন্য বাইবেলের বিভিন্ন পদের সমর্থন পেতে চেষ্টা করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা সেই সমর্থন পেয়ে তারা বেশ সন্তুষ্টি লাভ করে।

পবিত্র শাস্ত্রের কতকগুলি পদের বিছিন্ন কিংবা ভাসা-ভাসা ধারনার অধ্যায়ন তাদেরকে ঐসব নিজস্ব চিন্তা ধারার নিরাপত্তা দান করে। তাছাড়া বাইবেলের যেসব পদ তাদের চিন্তা ধারার সমর্থনের অনূকুলে এবং সেগুলি চিন্তাধারার পক্ষে নয় সেগুলি বর্জন করার মধ্যে দিয়ে তারা এমন সন্তুষ্টি লাভ করে থাকে। এছাড়াও এমন কিছু মনগড়া মতবাদ দেখা যায় সেগুলি বাইবেলের সাধারন শিক্ষার বাইরে থেকে এলেও বিচ্ছিন্ন কিছু পদ বা উদৃতি সেগুলিকে সমর্থন করে। প্রায়ই দেখা যায় ঐসব মনগড়া মতবাদের সাধারন প্রবনতা থাকে একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং মতবাদগুলি চুড়ান্ত ও মৌলিক পরিনতি কখনই বাইবেলের সামগ্রিক শিক্ষার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। সুতরাং ঐ সব মতবাদের ক্ষেত্রে যেসব মতপার্থক্য আসে সেগুলি স্থায়ী স্বীকৃতি পায় না।

দ্বিতীয়ত: নির্দিষ্ট কতকগুলি চার্চ এমনকিছু মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত সেগুলি সাধারনত যেসব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত সেগুলির থেকে বেশি গুরুত্বপায়। যার ফলে অন্যসব গুরুত্বপূর্ণ বাইবেলীয় শিক্ষা অবহেলিত হয়। এসব

মতবাদের চুড়ান্ত ফলাফল প্রকৃত বাইবেলীয় শিক্ষার সাথে চরম ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করে এবং যার ফলশ্রুতিতে শেষপর্যন্ত ভ্রান্ত বা বিকৃত বিশ্বাস ও পরিত্রাণের বিশৃংখল কিছু ধ্যান ধারনার জন্ম দেয়।

ফলশ্রুতিতে আজকের ধর্ম জগতে, ঈশ্বরের রাজ্যের বাইবেলের কর্তৃত্ব ও উৎস, যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমণ, বাপ্তিস্মের গুরুত্ব, প্রকৃত চার্চের প্রকৃতি, প্রভুর ভোজের প্রকৃত অর্থ, মানুষের আসল প্রকৃতি, যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান এবং মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও একেবারে বিতর্কহীন ব্যাখ্যা খুজে পাওয়া সত্যিই বড় কঠিন।

বহু চার্চ বহু যুগ যুগ ধরে তাদের লোকদেরকে আত্মার অমরত্বের মতবাদগুলি ধর্মতত্বের ভিত্তিতে শিক্ষা দিয়ে আসছিল। কিন্তু এখন তারা দেখছেন তাদেরই নিজস্ব কিছু শীর্ষস্থানীয় ধর্মতাত্ত্বিক ও লেখক এই কথা বলছেন যে, ঐসব ধর্মতত্ত্বীয় শিক্ষা বাইবেল ভিত্তিক ছিলনা, ছিল মানুষের প্রথাগত ঐতিহ্যের ভিত্তিতে এবং একজন ব্যক্তির শুধু বেঁচে থাকা বা অমরনশীল থাকার বিষয়টি কখনই এভাবে সম্ভব হয়ে আসবে না যে তার আত্মা মৃত্যুর সময়ই স্বর্গে চলে যাবে, বরং এটা ঠিক যে, যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সময় দেহের পুনরুত্থানের সময় এই আত্মা আবার সক্রিয় বা জীবিত হয়ে উঠবে। এটাই মুলত মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে বাইবেলের দৃষ্টিভঙ্গী, তবে খুব অল্প সংখ্যক খ্রীষ্টিয়ানই এটা বিশ্বাস করে। বাইবেল বলে মানষ মরনশীল। বাইবেলের কথায় এটা খুবই সহজবোধ্য ও সচরাচর বিষয়। তা সত্ত্বেও আজকের ধর্মীয় জগতে মানুষের এই মরনশীলতা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা, সন্দেহ-অবিশ্বাস ও মতপার্থক্য। এই একক মতবাদের উপর ভূল বোঝাবুঝি বা ভ্রান্তধারনাই সমস্ত বিভ্রান্তি ও মতপার্থক্যের প্রতিনিধিত্ব করে। যেপথ ধরে যে কেউ খ্রীষ্টিয় সত্য খুজতে চেষ্টা করে তাদের অনেকে প্রায়ই হতাশ ও নিরাসক্ত হয়ে পড়েন।

অনেকসময় ভিন্ন মতপার্থক্যের মণ্ডলীগুলিতে এমন ধারনা প্রকাশ করা হয় যে, আপনি কি বিশ্বাস করেন কিংবা কোন চার্চে অংশগ্রহণ করেন সেটা কোন বিষয় নয়। কারণ বহু মতবাদগত মণ্ডলী রয়েছে তার মধ্যে থেকে পছন্দসই একটা বেছে নিলেই চলে।

## এটা কি কোন বড় বিষয় ?

প্রথমত আমরা সাধারন কিছু ধারনার মাধ্যমে বিষয়টি একটু যাচাই করার চেষ্টা করি। ধরুন, কোন একজন রোগী হাসপাতলে আছেন, তার অস্ত্রোপাচার (অপারেশন) হবে বলে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু যে সার্জন তাকে অপারেশন করবেন তিনি এই মতামত প্রকাশ করছেন যে, অপারেশন করবার নীতিমালা অনুসরন করা কোন বড় বিষয় নয় - বরং বড় বিষয়টি হচ্ছে অপারেশনের সঠিক যন্ত্রপাতি সহকারে ঠিকমত অপারেশন করা। আমার মনেহয়, ঐ রোগী বিষয়টি জানার পর নিশ্চয় ঐ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসবেন।

ঠিক একইরকমভাবে কেউ একজন বিমানে যাত্রা করার জন্য টিকেট নিলেন। পরে জানতে পারলেন যে পাইলট বা বিমান চালক বিমানটি চালাবেন তিনি মনে করেন বিমান চালাবার ক্ষেত্রে আকাশ নেভিগেশন নীতিমালা মেনে চলা বড় বিষয় নয়, বরং বড় বিষয়টি হচ্ছে বিমানটিকে আকাশে উড়িয়ে নেওয়া ও পথের দিক নির্দেশনা ঠিকভাবে রক্ষা করা। আমার ধারনা ঐ বিমানযাত্রী নিশ্চিত অন্য কোন বিমানে যাবার জন্য এই বিমানটি পরিত্যাগ করবেন।

অবশ্যই এই ধরনের উদাহরণগুলি কাল্পনিক ও হয়ত খুব যুক্তিসংগত নয়। তবে যখন এই উদাহরন দু'টিকে ধর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে তখন সেটি অবশ্যই বড় ধরনের ও মারাত্মক ভুল হিসাবে প্রমানিত হবে, যা অনেক ক্ষেত্রে আবার যুক্তিসংগত ও ক্ষতিকরও হয়। ব্যাপক সংখ্যাক মানুষ এই দৃষ্টিভঙ্গী ধারন করেন যতক্ষন পর্যন্ত আমি যুক্তিসংগত, সম্মানজনক জীবন-যাপন করি ততক্ষন পর্যন্ত ঈশ্বর সম্পর্কে কি বিশ্বাস করি তা কোন বড় বিষয় নয়। কিন্তু আসলেই কি এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী সঠিক ? এটা কি এরকম বিষয় নয়, ঈশ্বর, যিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং যুগের পর যুগ ধরে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-নীতি দ্বারা এই পৃথিবীকে ধরে রেখেছেন ও পরিচালনা দিচ্ছেন, যে পরিচালনা

অপরিবর্তনশীল ও পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় রয়েছে সেই প্রথম থেকে - সেই ঈশ্বরকে মানুষ কিভাবে ভক্তি-সম্মান দেখানো তা কি কোন বিষয় নয় ?

এটা আশা করা কি ন্যায়সংগত হবে না যে, ঈশ্বরের সৃষ্ট নারী ও পুরুষ তাঁর সম্পর্কে কি চিন্তা করে এবং তাঁর বাক্য কতখানি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করে - এসব বিষয়ে ঈশ্বর গভীরভাবে চিন্তা করেন ? বাস্তব সত্যটি হচ্ছে, এবিষয়ে মানুষ তার আপন গভীর অনুভূতিটি প্রকাশ করতে পারেনি। ঈশ্বর যুগ যুগ ধরে কথা বলেছেন এবং বাইবেলকে ঈশ্বরের সেই কথা বা বাক্য হিসাবে দাবী করা হয়। আর এখানেই ঈশ্বর সেই সত্য ধর্মের নীতিমালা প্রকাশ করেছেন। যে নীতিমালার মধ্যে দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে আসতে পারি এবং তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারি ও তাঁর দেওয়া পরিত্রাণ গ্রহণ করতে পারি।

তাহলে উপরের উদাহরনগুলোর সাথে মিলিয়ে এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে বলা যায় যে দেহে অস্ত্রোপাচার কিংবা বিমান যাত্রার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না মানলে যে চরম বোকামী ও ভয়ংকর বিপদজ্জনক পরিনতির সম্মুখীন হতে হয়, তেমনি প্রকৃত ধর্মীয় নীতিমালা না মেনে চললে একই অবস্থা হয়। তবে আপাতত দৃষ্টিতে প্রকৃত ধর্মীয় নীতিমালা না মানলে হয়ত তেমন কোন চাক্ষুস বিপর্যয় আসেনা, কিন্তু চুড়ান্ত পর্যায়ে এর স্থায়ী ও অনিবার্য বিপর্যয় আসে। আবার ঠিক সুনির্দিষ্ট ঔষধ বা চিকিৎসা ও বিমান যাত্রার সঠিক নিয়ম-নীতি ছাড়া আপনার দেহ যেমন অচল হয়ে যেতে পারে, তেমনি সঠিক ধর্মীয় নিয়ম-নীতি ছাড়া আপনার জীবনও অচল হতে পারে।

## সহনশীলতা বলতে কি বুঝি ?

ধর্মীয় সহনশীলতা ততক্ষন পর্যন্ত আর্শীবাদ যতক্ষন কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়াই মানুষ স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারেন। কিন্তু সেই আর্শীবাদ অনেকখানি দুষিত হয়ে পড়ে যখন আমরা মানুষকে সঠিক ধর্মীয় রং চিনে নিতে সাহায্য না করে বরং অন্ধ করে তুলি, যা তাদেরকে সাদাকে সাদা কিংবা কালোকে কালো হিসাবে চিন্‌তে বা বলতে অক্ষম করে তোলে।

প্রাচীনকালে ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর মানুষের আস্থা ছিল অত্যন্ত গভীর তখন তারা ধর্মের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করে কোনটা সঠিক কোনটা ভুল তা জোরালোভাবে বলতেন। কিন্তু আজকের এই ধর্মীয় উদারতা ও আপোষকামীতার যুগে ধর্মের ভুল-ত্রুটি বা মতপার্থক্য তুলে ধরার বিষয়টি অনেকটা উঠে গেছে বা সেকেলে হয়ে গেছে। এমনকি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা লজ্জার ব্যাপার মনে করেন অনেকে। খুবকম সময়ই নীতিগত বিষয়গুলিতে মানুষকে শক্ত অবস্থান নিতে দেখা যায়। এখন মধ্যপন্থা গ্রহণ করাই মূখ্য বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে এবং যখনই দেখা যায় ধর্মীয় বিশেষ কোন ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা দেয়, তখনই সেটি আর অন্য সকলের সমর্থন পায় না। অনেকক্ষেত্রে এট মনেহয় যে, সবথেকে বড় ব্যাপারটি হচ্ছে, কোন বিষয়েই চুড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তে না আসা। অনেকে অনেক সময় এই ধরনের বাগধারা ব্যবহার করেন যে, "আলোচনা-পর্যালোচনা করে ও বিবেচনা করো কিন্তু কখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো না" কিংবা "কিছু কিছু ধর্ম হয়তবা অন্য ধর্মগুলোর চেয়ে ভালো কিন্তু সকল ধর্মই আসলে উত্তম"। যেটি আপনার জন্য ভালো সেটি বেছে নিন এবং সব থেকে উত্তমভাবে তার সাথে থাকুন ও অন্য ধর্মের কোন ক্ষতির কারণ যেন না হন"। এমন আরও অনেক বিষয়। এইসব আপাত দৃষ্টিতে সঠিক মনেহওয়া বিষয়গুলির মধ্যমপন্থা ও আপাত যুক্তিসংগত অবস্থা থাকলেও বাস্তবে এসব বিষয়গুলি বাইবেলের শিক্ষার সাথে মতবিরোধ রয়েছে। একটা সত্য ধর্মে অনিবার্যভাবে যা প্রয়োজন-বাইবেল যা বলে তাহচ্ছে, সহনশীলতার ধারনা বা শিক্ষা। অনেকে দাবী করে যে, এটি প্রকৃত বা সত্য ধর্ম, কিন্তু সেখানে সহনশীলতা নাই বা সহনশীলতার বিষয়গুলি বাইবেলের শিক্ষার সাথে মতপার্থক্য সৃষ্টি করে, সেগুলি অবশ্যই ভ্রান্ত বা মিথ্যা বলে প্রমানিত। এধরনের আপাত: দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষা ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য সুখকর নয়, কিন্তু সহজ-সরল মনের মানুষের কাছে অনেকসময় যুক্তিসংগত বলে মনেহয়।

ঈশ্বরকে তুলেধরার পদ্ধতিগত বিষয়টিতে বাইবেল একেবারে শর্তবিহীনভাবে উপস্থাপন করে। এখানে তার একটি উদাহরন হল-

> *"কিন্তু বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য নয়; কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হয়, তাহার ইহা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে ঈশ্বর আছেন, এবং যাহারা তাঁহার অন্বেষণ করে, তিনি তাহাদের পুরস্কারদাতা"* (ইব্রীয় ১১ঃ৬)।

এখানে *"সাধ্য নয়"* ও *"আবশ্যক"* শব্দগুলি লক্ষ্যকরুন। লেখক কখনই একথা বলেননি বিশ্বাসে ঈশ্বরের কাছে আসা "ভালো বা সংগত" অথবা বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরের কাছে আসা "কঠিন"। বরং লেখক বলছেন, বিশ্বাস ছাড়া তাঁহার (ঈশ্বরের) প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য নয় (বা সম্ভব নয়) এবং ইহা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে ঈশ্বর আছেন। এসব শব্দগুলির মাঝে কোন মধ্যপন্থা অর্থ প্রকাশ করা হয়নি।

যার ফলে এই ধরনের প্রশ্ন উঠে আসে, "কেন আমি এরকম কাজ করবনা ? এক্ষেত্রে আমার কোন ভুল আছে কিনা ?" কিন্তু বাইবেল একথা প্রকাশ করে যে, কোন মানুষের জন্মগত কোন ভালো গুণের জন্য ঈশ্বর কখনই তাকে গ্রহণ করেন না। এটা সবসময়ই ঈশ্বরের কাছে অগ্রহণযোগ্য ও অন্যায়। বহু মানুষ আছেন যারা খুব খারাপ পরিস্থিতিতে জন্মগ্রহণ করেন ও খুব অমর্যাদাকর অবস্থায় পরিবেশে জীবন-যাপন করেন। সুতরাং তার জন্য জন্মগত ভালোগুনগুলির বিকাশ প্রায় সম্ভব নয়। কিন্তু অনেকেই আছেন যারা বেশ ভালো পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন ও বেশ স্বাস্থ্যকর সুখময় পারিপার্শ্বিকতায় জীবনযাপন করেন। যার ফলে জন্মগত ভালো গুনগুলো সহজেই বিকাশ লাভ করার সুযোগ পায়। আর এজন্যই এমন অন্যায্য বাস্তবতার কারণে ঈশ্বর কখনই শুধু জন্মগত গুণ থাকার ফলশ্রুতিতে কাউকে গ্রহণ করেন না।

## যেসব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ঈশ্বর মানুষকে গ্রহণ করেন

ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সব মানুষই পাপী এবং তাঁর উপস্থিতিতে মানুষের মধ্যে ভালো যা কিছু আছে তা ঈশ্বরের পবিত্রতা যাচাইয়ে যথেষ্ট নয়। ধার্মিকতা, পবিত্রতা ও ন্যায্যতার একটি মাত্র মান বা ষ্ট্যান্ডার্ড রয়েছে, আর তা হচ্ছে ঈশ্বরের নিজস্ব মান বা ষ্ট্যান্ডার্ড। ঈশ্বর কখনই কোন নারী ও পুরুষকে তার সেই মানের সাথে খাপ খাইয়ে গ্রহণ যোগ্য করে নেবার জন্য কোন প্রকার আপোষ করেন না। আজকের যুগের মানুষদের পাপ কোন ক্ষেত্রেই নোহ অথবা আদম-হবার সময়কার পাপের চেয়ে কম নয়। ঈশ্বরের প্রকৃতিতে বিন্দুমাত্র কোন পরিবর্তন আসেনি যিনি পাপকে ঘৃনাকারী হিসাবে আজকের পাপকে কোন ক্ষেত্রে হাল্কা করে দেখেন না। ঈশ্বরের ধার্মিকতার মান মানুষের মানবীয় ভালো গুণের মানের সাথে তুলনা করা সত্যিই বড় কঠিন ও শুধু শুধু শক্তি-মেধা ক্ষয় করার মত ব্যাপার। আমাদের কখনই এমন সব ভালো গুণের ফলাফল দেখিয়ে যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য ঈশ্বরের সামনে আসা উচিত নয় যে, আমরা খুব সৎ লোক, আমরা আমাদের ঋণ ঠিকমত পরিশোধ করি ও কখনই আমাদের প্রতিবেশীকে কোন ক্ষতি করি না। তবে ঈশ্বরকে সম্মান দেখানোর প্রশ্নে এটি একটু গুরুত্বপূর্ণ হলেও পরিত্রাণ পাবার প্রশ্নে এটি যথেষ্ট নয়। মানুষ হিসাবে আমাদের যৎসামান্য ধার্মিকতা কখনই ঈশ্বরের আনুকুল্য পাবার জন্য যথেষ্ট নয়। বাইবেল আমাদেরকে শিক্ষা দেয যে, আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের নিজেদের নৈতিকতাকে অস্বীকার করতে হবে এবং অবশ্যই এই সত্যটি স্বীকার করতে হবে যে, ঈশ্বরের পবিত্রতার মান বা ষ্ট্যান্ডার্ড -এর সাথে আমাদের কোন ভালো গুনের পরিমাপ করতে পারিনা। আর এই দুর্বলতা অকপটে স্বীকার করাই হচ্ছে, "অনুতপ্ত হওয়া"।

নারী ও পুরুষের জন্মগত ভালো গুনগুলি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অপর্যাপ্ত হওয়ায় যেহেতু এগুলি দ্বারা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণ যোগ্য হতে পারেনা, সেহেতু ঈশ্বর মানুষকে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস -এর ভিত্তিতেই গ্রহণ করেন। মানুষ যে বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি দেখায় সেটাই তাকে ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক গননা করে। আর এটাই "বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিক গনিত হওয়া" -এই মহান মতবাদ তৈরী করেছে। এখানে বলা হয়েছে বিশ্বাসহীন অবস্থায় কেন ঈশ্বরের কাছে আসা সম্ভব নয় ও যারা

ঈশ্বরের কাছে আসতে চায় তাদেরকে অবশ্যই তাঁর উপর বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বাস স্থাপনের এই মহান নীতি বাস্তবে কিভাবে কাজ করে তা দেখানোর জন্য প্রেরিত পৌল অব্রাহামের উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। অব্রাহাম ঈশ্বরের কাছ থেকে নির্দিষ্ট কিছু প্রতিজ্ঞা পেয়েছিলেন, সেগুলি তারা যেসময়ে এই পৃথিবীতে ছিলেন, তখন পূর্ণতা লাভ করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু অব্রাহাম এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিশ্বাসকে শক্তভাবে ধরে রেখেছিলেন এবং একসময় ঈশ্বর তার এই দৃঢ় বিশ্বাসকেই ধার্মিকতা হিসাবে গন্য করেছিলেন :

*"ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অবিশ্বাস বশতঃ সন্দেহ করিলেন না; কিন্তু বিশ্বাসে বলবান হইলেন, ঈশ্বরের গৌরব করিলেন এবং নিশ্চয় জানিলেন, ঈশ্বর যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সকল করিতে সমর্থও আছেন। আর এই কারণ তাঁহার পক্ষে উহা ধার্মিকতা বলিয়া গণিত হইল। তাঁহার পক্ষে গণিত হইল, ইহা যে কেবল তাঁহার জন্য লিখিত হইয়াছে, এমন নয়, কিন্তু আমাদেরও জন্য; আমাদের পক্ষেও তাহা গণিত হইবে, কেননা যিনি আমাদের প্রভু যীশুকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, আমরা তাঁহার উপরে বিশ্বাস করিতেছি। সেই যীশু আমাদের অপরাধের নিমিত্ত সমর্পিত হইলেন, এবং আমাদের ধার্মিক গণনার নিমিত্ত উত্থাপিত হইলেন"* (রোমীয় ৪ঃ২০-২৫)।

পৌল জোর দিয়ে একথা বলেছেন যে, অব্রাহামের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের যে নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে সেটি অন্য সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য যারা পরিত্রাণ লাভের জন্য ঈশ্বরের কাছে আসতে চায়।

ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে'বিশ্বাস' সর্বাপেক্ষা অনিবার্য বিষয় হিসাবে নির্দিষ্ট একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়। এটাই নতুন জীবন শুরু হবার চিহ্ন, প্রকৃত বা সত্য ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ, যে বিষয়ে প্রেরিত পিতর বলেন,

*"...তোমরা ক্ষয়ণীয় বীর্য হইতে নয়, কিন্তু অক্ষয় বীর্য হইতে ঈশ্বরের জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্য দ্বারা পুনর্জাত হইয়াছ"* (১ম পিতর ১ঃ২৩)।

এই কারণে নূতন নিয়মের বহু অংশে বিশ্বাস -এর প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব দিয়ে অনেক কিছু লেখা হয়েছে:

*"তিনি নিজ অধিকারে আসিলেন, আর যাহারা তাহার নিজের, তাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন"* (যোহন ১ঃ১১-১২)।

*"কিন্তু বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য নয়; কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহার ইহা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, ঈশ্বর আছেন..."* (ইব্রীয় ১১ঃ৬)।

*"আর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর। যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে"* (মার্ক ১৬ঃ১৫-১৬)।

## বিশ্বাস নাকি কুসংস্কার ?

বিশ্বাস এত গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, ঈশ্বর যে'বিশ্বাস' -এর প্রত্যাশা করেন সেটি কখনই কোন মিথ্যা বা মনগড়া কোন কিছুর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না, ঈশ্বর সেই বিশ্বাস -এর উপরই গুরুত্ব দেন যে বিশ্বাস সত্য বা প্রকৃত। কারণ যে বিশ্বাস -এর মধ্যে ভ্রান্তি বা মিথ্যা বিষয় রয়েছে সেটাই প্রকৃতপক্ষে কৃসংস্কার। বাইবেল বলে -

*"কেননা সে অন্তরে যেমন ভাবে, নিজেও তেমনি"* (হিতোপদেশ ২৩ঃ৭)।

এই পদটি আমাদেরকে পরিস্কারভাবে বলে, চুড়ান্ত পর্যায়ে মানুষ সেই কাজটিই করে যেটি সে অন্তরে বিশ্বাস করে। একারণেই মিথ্যা বিশ্বাস বা ভ্রান্তবিশ্বাস মানুষের জীবনকেও মিথ্যা পথে পরিচালিত করতে বাধ্য করে।

নূতন নিয়মের লেখকরা এবিষয়টি জানতেন। এজন্য তারা বার বার বিশ্বাসীদেরকে প্রকৃত সত্য বিশ্বাস গ্রহণ করার জন্য চেতনা দিয়েছেন। প্রেরিত পৌল এবিষয়ে বেশ শক্তভাবে কিছু কথা বলেছেন, এভাবে-

> *"কিন্তু আমরা তোমাদের নিকটে যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহা ছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেহ প্রচার করে- আমরাই করি, কিম্বা স্বর্গ হইতে আগত কোন দূতই করুক তবে সে শাপগ্রস্ত হউক"* (গালাতীয় ১ঃ৮)।

কথাগুলি পৌলের চরম আনুষ্ঠানিক মন্তব্য। যারা ভ্রান্ত বা বিকৃত সুসমাচার প্রচার করেন তাদের বিরুদ্ধেই পৌল এইচরম অভিশাপ দিয়েছেন। ঈশ্বরের সত্যের সাথে আপোষহীনতার বড় প্রমান এটি। পৌলের এই মনোভাব আজকের আধুনিক ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের মনোভাবের সাথে কত ব্যাপক পার্থক্যকে তুলে ধরে, যারা সহজেই ঈশ্বরের নানা সত্য সম্পর্কে অন্যদের সাথে আপোষ করেন, এমনটি একেবারে ভিন্ন বিষয় বা বিশ্বাস হলেও এবং যার ক্ষতিকর পরিনতি জেনেও -এসব আপোষ করা হয়। পৌল এবিষয়ে বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন যে, তিনি যে সুসমাচার প্রচার করেছেন সেটিই সত্য বা প্রকৃত সুসমাচার এবং অন্য যা কিছু এর সাথে মিল হয় না সেটিই মিথ্যা সুসমাচার। পৌল এবিষয়টি সবসময় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন যে, ঈশ্বরের সত্য ও তাঁর উদ্দেশ্যের মান বা ষ্ট্যান্ডার্ড অবশ্যই বর্ণনাযোগ্য। যারা এর থেকে দুরে সরে যায় তারাই বিপদজনক হয়ে ওঠে।

আজকে এধরনের কথা বেশ জনপ্রিয় বা সহজেই গ্রহণযোগ্য যে, প্রকৃত খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস কখনই লিখিতভাবে সংগায়িত করা যায় না। মনেকরা হয় যে, এটা খুবই ব্যক্তিগত ও রহস্যজনক। আর এটাই সেই ধরনের মনোভাব গঠনে অনেককে সাহায্য করে যে, আপনি কি বিশ্বাস করেন ও কোন চার্চে উপাসনা করেন সেটা কোন বিষয় নয়। কিন্তু এধরনের চিন্তা অবশ্যই ভুল বা মিথ্যা। কারণ নূতন নিয়মে মণ্ডলীকে *"সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি"* (১ম তীমথিয় ৩ঃ১৫) বলা হয়েছে এবং এদ্বারাই সবকিছুকে যাচাই করা হয়। আজকে প্রতিটি খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীর শিরোধার্য কর্তব্য হচ্ছে, তাঁর বিশ্বাস ও তাঁর মণ্ডলী কোন সত্য স্তম্ভ ও ভিত্তির উপর দাড়িয়ে আছে তা যাচাই করা বাইবেলে প্রকাশিত পবিত্র বাক্য দ্বারাই।

শমরীয় নারীকে সত্য ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা দেবার সময় যীশু অত্যন্ত তাৎপর্যপুর্ণ কিছু কথা ব্যবহার করেছিলেন-

> *"কিন্তু এমন সময় আসিতেছে, বরং এখনই উপস্থিত, যখন প্রকৃত ভজনাকারীরা **আত্মায় ও সত্যে** পিতার ভজনা করিবে; কারণ বাস্তবিক পিতা এইরূপ ভজনাকারীদেরই অন্বেষণ করেন"* (যোহন ৪ঃ২৩)।

যীশু প্রকৃতপক্ষে যে সত্য ধর্মের কথা বলতে চেয়েছেন সে ধর্মে বাহ্যিক বা লোক দেখানো বিষয় ও বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠানিকতা বড় বিষয় নয়, আবার নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে প্রসংশা কিংবা নতজানু থাকবার দক্ষতা দেখানোর বিষয় নয়, বরং আমাদের অন্তরের অবস্থা অর্থাৎ আত্মিক অবস্থা কি সেটাই বড় বিষয়। আসলে ঈশ্বর কিভাবে জীবনযাপন করার জন্য বলেছেন সেভাবে জীবনযাপন করাই গুরুত্বপুর্ণ বেশি। মুখে ঈশ্বরের প্রসংশা করা ও জীবন-যাপন দিয়ে তাঁর অসম্মান করা সোজা ব্যাপার। আত্ম-সমপর্ণের গান গাওয়া ও বিনয়ের সাথে মাথা নুইয়ে দেখানো যায়, কিন্তু মুল বিষয় অন্তরটা হয়ত গর্ব-অহংকারে ময়ুরের মত মাথা উচু করে থাকতে পারে। এজন্য আমরা যে সত্য ধর্মে বিশ্বাস করি তার প্রমান রাখতে হবে আমাদের বাধ্যতার জীবন-যাপনের মধ্যে দিয়ে। আসল প্রয়োজনটি হচ্ছে বিনম্রতায় ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যের মধ্য থেকে সত্য খুজে বের করতে হবে ও সেই অনুসারে জীবন-যাপন করে দেখাতে হবে। আর এটাই *"আত্মায় ও সত্যে ঈশ্বরের উপাসনা"* করা।

## জীবন ও মৃত্যুর বিষয়

যারা ধর্মতত্ত্বের প্রতি আগ্রহী অথবা যারা ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা বা বিতর্ক করতে চান তাদের জন্য যে এই বিষয়গুলি প্রয়োজন তা নয়। কিন্তু যারা পরিত্রাণ পেতে চান তাদের সবার জন্য এটি জীবন ও মৃত্যুর মত ব্যাপার। এসব প্রশ্নগুলিই বড় ব্যাপার হয়ে দাড়াবে যে, বাইবেলে যেসব নীতিমালা চিরস্থায়ী ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে সেসব স্থান থেকে

সত্য সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির উত্তর খুজে পাবার চেষ্টা করতে হবে। যেসব নীতিমালা ঈশ্বর সম্পর্কিত আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীগুলিকে নিয়ন্ত্রন করে সেগুলির স্থায়ীত্ব চিরকালিন; এগুলি সবসময়ই ব্যবহারিক; সবসময়ই এগুলি চিরন্তন বা চিরনতুন।

লেবীয় পুস্তকে দু'জন ব্যক্তির দুটি ঘটনার উল্যেখ আছে যারা এই নীতিমালাকে অবজ্ঞা করেছিলেন এবং তাদের পরিনতি হয়েছিল খুবই দুঃখজনক। নাদব ও অবিহু, দুজনেই ছিলেন ঈশ্বরের মন্দিরের পুরোহিত এবং তাদের জীবন উপাসনা পরিচালনা ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত হত ঈশ্বরের নির্দেশাবলীর মাধ্যমে:

> *"আর হারোণের পুত্র নাদব ও অবীহূ আপন আপন অঙ্গারধানী লইয়া তাহাতে অগ্নি রাখিল, ও তাহার উপরে ধূপ দিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে তাঁহার আজ্ঞার বিপরীতে ইতর অগ্নি উৎসর্গ করিল। তাহাতে সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিল, তাহারা সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিল। তখন মোশি হারোণকে কহিলেন, সদাপ্রভু ত ইহাই বলিয়াছিলেন, তিনি কহিয়াছিলেন, যাহারা আমার নিকটবর্তী হয়, তাহাদের মধ্যে আমি অবশ্যই পবিত্ররূপে মান্য হইব, ও সকল লোকের সম্মুখে গৌরবান্বিত হইব। তখন হারোণ নীরব হইয়া রহিলেন"* (লেবীয় পুস্তক ১০ঃ১-৩)।

পুরোহিতদের দায়িত্ব ছিল সদাপ্রভুর সামনে/উদ্দেশ্যে ধুপ-ধুনা উৎসর্গ করা এবং তা কিভাবে উৎসর্গ করতে হবে তা সুচারুভাবে ঈশ্বর নির্দিষ্ট করে বলেদিয়েছিলেন। অথচ ঐ দুজন ঈশ্বরের বলে দেওয়া নির্দেশনাগুলি অবজ্ঞা করেছিলেন এবং ঈশ্বরের মন্দিরের বেদীর সামনে যে আগুন থাকে সেখান থেকে আগুন না নিয়ে তারা বাইরের অন্য উৎস থেকে অপবিত্র আগুন নিয়ে তা উৎসর্গ করেন। সম্ভবত এটি তারা সতর্কহীন থাকার কারণেই করেছিলেন, অথবা অন্য কোন কারণ হতে পারে, অথবা বুঝেই ঈশ্বরের নির্দেশনাকে অসম্মান করার জন্য এটি করেছিলেন। ফলে ঈশ্বর তাদের উপাসনার সব উৎসর্গ প্রত্যাখান করেন। কারণ তিনি যেভাবে বলে দিয়েছিলেন তারা সেভাবে উপাসনা করেননি।

অনেকে হয়ত একথা বলবেন যে, লক্ষ্য যদি সঠিক হয় তবে একটু ভুল পথে বা পক্রিয়ায় তা বাস্তবায়ন করা অন্যায় হবে না- এজন্য কোন কাজের ফলাফল যদি ভালো আসে তবে তার ভুল বা ভ্রান্তিজনক পথকে দোষারোপ করা ঠিক নয়। কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনার ক্ষেত্রে এই চিন্তা করা কখনই ঠিক হবে না। কারণ হারোনের দুজন ছেলের করুন পরিনতি "ফলাফলই নির্ধারন করে দেয় বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সঠিকতা" -এই মতবাদের অসারতা ও ভুল প্রমান করে। এটা দেখায় যে, ঈশ্বরের উপস্থিতিতে তাঁর উপাসনার ক্ষেত্রে মানুষের মনগড়া পদ্ধতি কখনই ঈশ্বরের চিন্তার সাথে মেলে না, কারণ যেটা আমরা সঠিক বলে দাবী করে নিজেদের সন্তুষ্টি লাভ করছি সেটা নিশ্চয় ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না।

বার বার নানাভাবে বাইবেল আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, সত্য কখনই মিথ্যা পথের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে পারে না, আবার কখনই সত্য দুর্ণীতিগ্রস্ত ভিত্তির উপর দাড়াতে পারে না। আপনি কখনই ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে তাঁর সঠিক উপাসনা করতে পারেন না। নাদব ও অবীহূ যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে পারেনি, তেমনি আমরাও তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁকে মহিমান্বিত করতে পারব না। ঈশ্বরের আদেশের প্রতি অবজ্ঞা করে মানুষের নিজের ইচ্ছায় ঈশ্বরের উপাসনা করে কখনই কোন শুভ ফল আনা সম্ভব নয়- যা আগেও সম্ভব হয়নি, এখনও সম্ভব নয়। ঈশ্বর কখনই তার স্বভাব-প্রকৃতি অথবা তাঁর উদ্দেশ্য পরিবর্তন করেননি ও করেন না। যারা তাঁর উপাসনার জন্য তার সামনে দাড়াবে, তারা অবশ্যই তাঁর ইচ্ছা খুজে পাবার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে, এবং তারা তাঁর মুল অনুভূতি বা বোঝার চেষ্টা করবে ও সেটির প্রতি পূর্ণভাবে বাধ্য থাকবে। আবারও বলতে হয় মোশী তার ভাইয়ের ছেলেদের করুন মৃত্যুর পর যে কথাগুলি বলেছিলেন, সেগুলি আজও সমানভাবে সত্য-

> *"...সদাপ্রভু বলেছেন, যারা আমার কাছে আসে তারা যেন আমাকে পবিত্র বলে মান্য করে। লোকদের চোখে তারা যেন আমার সম্মান তুলে ধরে"* (লেবীয় ১০ঃ৩)।

ঈশ্বরকে যদি গৌরবান্বিত করা হয় তবে অবশ্যই তাকে মান্য করতে হবে। যদি কোন চার্চ মানুষকে এসব বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করে যে, ঈশ্বরের বাক্যের উপর সবসময় বিশ্বাস করা যায় না, অথবা তাঁর আদেশসমুহ অবহেলা করা যায়, অথবা নির্দিষ্ট কোন মতবাদে আমরা বিশ্বাস করি বা না করি সেটা বেছে নেওয়া আমাদের ব্যাপার- তাহলে অবশ্যই সেগুলি মিথ্যা বা ভুল চিন্তা। কারণ এগুলি পর্যালোচনার চুড়ান্ত পর্যায়ে ঈশ্বরকে অমান্য করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশ তা স্বয়ং ঈশ্বরকে অমান্য বা অস্বীকার করার পর্যায়ে চলে যায়।

## সত্য যাচাই করা

এই যুক্তিতে আত্মপক্ষ সমর্থন করা ঠিক নয় যে, আমরা অন্যদের দ্বারা ভ্রান্ত বা ভুল পথে পরিচালিত হয়েছি। কারণ স্বর্গের উচ্চ আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের এই যুক্তি টিকবে না, কারণ যীশু বলেন,

> *"...যদি অন্ধ অন্ধকে পথ দেখায়, উভয়েই গর্তে পড়িবে"* (মথি ১৫ঃ১৪)।

আবার এই যুক্তি দেখানো ঠিক নয় যে, আমরা কি বিশ্বাস করব ও কি কাজ করব তা আমাদের জ্ঞানী ও পন্ডিত ব্যক্তিরা শিখিয়েছেন। এইসব বিষয়গুলির যাচাই বা পরীক্ষা করার জন্য কোন বিশেষজ্ঞ বা পন্ডিত ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না, কিন্তু শুধু মাত্র ঈশ্বরের বাক্য দ্বারাই সত্য যাচাই বা অন্বেষন করা যায়। মানুষ নির্মিত ধর্ম কখনই ঈশ্বর নির্মিত ধর্মের বিকল্প হতে পারে না, তা সে যতই উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন হোক না কেন। যীশু শিক্ষা দেবার সময় পুরাতন নিয়মের এক ভাববাদীর কথা উল্যেখ করে এর অর্থগুলিকে পুনরায় গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছেন এভাবে-

> *"ইহারা অনর্থক আমার আরাধনা করে, মনুষ্যদের আদেশ ধর্মসূত্র বলিয়া শিক্ষা দেয়"* (মথি ১৫ঃ৯)।

> *"প্রভু কহিলেন, এই লোকেরা আমার নিকটবর্তী হয়, এবং আপন আপন মুখে ও ওষ্ঠাধরে আমার সম্মান করে, কিন্তু আপন আপন অন্তঃকরণ আমা হইতে দূরে রাখিয়াছে, এবং আমা হইতে তাহাদের যে ভয়, তাহাও মনুষ্যের আদেশ, মুখস্থ করা মাত্র"* (যিশাইয় ২৯ঃ১৩)।

আজকের জনপ্রিয় চার্চগুলির শিক্ষা যীশুর এসব শিক্ষা থেকে অনেক দুরে সরে এসেছে। বহু খ্যাতনামা শিক্ষকই আজকে ঈশ্বর ও তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বাইবেলের শিক্ষাকে অস্বীকার করেন, তারা নিজেদের মত করে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করেন, তারা ঈশ্বরের বাক্যের কর্তৃত্বকে খাটো করে দেখছেন এবং তাঁর আদেশ-নির্দেশকে জলে ডুবিয়ে দিচ্ছেন। মুল নৈতিকতার বিষয়টি হচ্ছে, আজকের তথকথিত জ্ঞানী-গুনী বা পন্ডিতদের মতামতের প্রতি আমাদের এতটা আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যেসব পন্ডিত ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বিশ্বস্ত বা বাধ্য তাদের মতামত গ্রহণ করতে পেরে কৃতজ্ঞ। তাই বলে বাইবেল কখনই এই পরামর্শ দেয় না যে, মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধিই স্বর্গীয় জ্ঞান-প্রজ্ঞার সীমায় পৌছানোর পাসপোর্ট হতে পারে না। তবে যারা প্রকৃতই খুব বিনয়ী ও সুন্দর আত্মাবিশিষ্ট তাদের জাগতিক জ্ঞান-বুদ্ধির মাঝেও স্বর্গীয় সত্য প্রকাশ পায়।

## বাইবেল শিক্ষা

বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করেই খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের মহান মতবাদগুলি গড়ে উঠেছে। বাস্তব ঘটনাসমুহকে অস্বীকার করে আপনি মতবাদকে মিথ্যা প্রমান করতে পারেন। যেমন, যীশু খ্রীষ্ট পবিত্র আত্মার শক্তিতে কুমারীর গর্ভে জন্ম লাভ করেছেন- এই বাস্তব ঘটনা অস্বীকার করা হলে যীশু আর ঈশ্বরের পুত্র থাকেন না, কিন্তু শুধুমাত্র পার্থিব যোষেফ -এর পার্থিব সন্তান হয়ে যান; অর্থাৎ তিনি শুধুই একজন সাধারন মানুষ- এর বেশি কিছু নয়।

আবার যীশুর দৈহিক পুনরুত্থানের বাস্তব ঘটনাটি অস্বীকার করলে, তা বিশ্বাসের মুল ভিত্তির উপর আঘাত করে এবং খ্রীষ্টের প্রেরিতদেরকে মিথ্যা সাক্ষী হিসাবে প্রমান করে এবং মৃতদেরকে তাদের কবরেই চিরকাল রাখার ব্যবস্থা করে। আবার যদি এই বাস্তব সত্য ঘটনাগুলিকে অস্বীকার করা হয় যে যীশু প্রচুর আশ্চর্য্য কাজ করেছেন, তবে আমরা তাঁর

ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও প্রকৃত মর্যাদাকে খাটো করে কেবল। কারণ যীশু নিজেই বলেছেন, তার অলৌকিক বা আশ্চর্য্য কাজগুলিই প্রমান করে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র।

প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানকারী অবশ্যই একসময় ঈশ্বরের সামনে তার নিজের দায়িত্বকে বুঝে নিতে পারেন এবং সতর্কভাবে বাইবেলের শিক্ষা অনুসরন করতে পারেন। কিন্তু কখনই অন্যের হাতে নিজের দায় দায়িত্বকে ছেড়ে দেন না।

একটা বিষয়ে নূতন নিয়ম অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় যে, মতবাদসমুহকে সংজ্ঞায়িত করা যায়। আজকে অনেকসময় আমরা একথা বলতে শুনি যে মতবাদগত বক্তব্য দ্বারা খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। কারণ এখানে এমন কিছু রহস্যের বিষয় আছে যেগুলির ব্যাখ্যা করা যায় না। আর এটাই যদি সত্যি হয় তবে এটা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পৌল তার লেখা গালাতীয় (১ঃ৬) পত্রে অত্যন্ত অবাক বিস্ময়ে একথাগুলি প্রকাশ করেছেন যে, অনেকেই ঈশ্বরের আসল সত্য থেকে দুরে সরে গিয়েছেন এবং সত্য সুসমাচার থেকে ভিন্নপথে চলে গিয়েছে। লক্ষ্য করার মত বিষয়টি হচ্ছে যে, যদি সেই বিষয়টি সুনির্দিষ্ট ভাবে সংজ্ঞায়িত না করা যায় তবে কিভাবে বলা যাবে যে, অনেকে এই বিষয় থেকে দুরে সরে গেছে । নিশ্চিতভাবেই নূতন নিয়মের শিক্ষা হচ্ছে যে, অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যে সংজ্ঞা দিয়ে বর্ণনা করার যোগ্য মান বজায় রাখা সম্ভব, যা দ্বারা যাচাই-বাছাই করা যায়। এখন সদাপ্রভু ঈশ্বর যদি তাঁর নিজের সম্পর্কে ও তাঁর কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যত্নসহকারে কোন সত্য প্রকাশ করতে চান তবে এধরনের আচরন করা কখনই যুক্তি সংগত হবে না যে, এসব মতবাদ তেমন গুরুত্ব সম্পন্ন কিছু নয়, এবং মানুষকে নিজের চিন্তায় মনগড়া যা বিশ্বাস করে সে সম্পর্কে আত্মতুষ্টি বা সন্তুষ্টি লাভ করতে পারেনা।

পুরাতন নিয়মের একটি পদ এবিষয়টি পরিস্কারভাবে বুঝতে সাহায্য করে-

> *"...কিন্তু এই ব্যক্তির প্রতি, অর্থাৎ যে দুঃখী, ভগ্নাত্মা ও আমার বাক্যে কম্পমান, তাহার প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিব"* (যিশাইয় ৬৬ঃ২)।

সদাপ্রভুর বাক্যের প্রতি "কম্পমান" এই কথার অর্থ হচ্ছে এই বাক্যের গভীর অনুভূতিতে বিনম্র হওয়া, বোঝা বা উপলব্ধি করা, একে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা ও সম্পূর্ণভাবে মান্য করা। ঈশ্বর যা প্রকাশ করেছেন তা যদি মানুষের চিন্ত াভাবনার সাথে সংগতিপূর্ণ হয় তবে কিংবা অন্যদিকে নিয়ে যায় বর্তমান চিন্তাধারাকে তবে মানুষকে খুশি হবার জন্য বলা হয়নি। বরং নারী ও পুরুষ সবাইকে তাদের বিশ্বাস বিশ্বস্তভাবে ও যত্নসহকারে যাচাই করতে বলা হয়েছে।

## জীবন-রক্ষাকারী মতবাদ খুজে বেড় করতে হবে

যারা তাদের বিশ্বাস গভীরভাবে খুজে পাবার জন্য উৎসাহিত হয়েছেন এবং তা ঈশ্বরের বাক্যের সাথে যাচাই করবার চেষ্টা করেছেন, প্রায়ই দেখা গেছে তারা আশ্চর্য্যভাবে সেইসব বিষয়গুলি বাইবেল থেকে আবিস্কার করতে সক্ষম হয়েছেন যেগুলি তারা ভুল বিশ্বাস হিসাবে জীবনের জন্য গ্রহণ করেছিলেন।

লেখক এবিষয়ে স্বীকৃতি দান করেন যে, এসব উপলব্ধি গুলি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল ছিল। আত্মার অমরত্বের মতবাদ, মৃত্যুর পর আত্মা স্বর্গে চলে যাবার প্রথাগত ধারনা অথবা মৃত্যুর পর আত্মা নরকে যাবার ধারনা - এসবই বাইবেল ভ্রান্ত হিসাবে প্রকাশ করে দেখায়। এই পুস্তিকার লেখক মন্দ আত্মার ভয়, শয়তান বা দিয়াবল ও শরীরী আত্মার ভয় ইত্যাদি বিষয়ের ভ্রান্তি বাইবেল থেকে খুজে পেতে সক্ষম হন।

এসব সত্ত্বেও বেঁচে থাকবার একমাত্র পথ হিসাবে পুনরুত্থানের তাৎপর্যের বাস্তব ও কেন্দ্রীয় বিষয় বাইবেলে আলোক বর্তিকার মত প্রকাশ পেয়েছে। আর সেই পুনরুত্থানটি বাস্তবে সত্য হবে প্রভু যীশুর রাজা হিসাবে এই জগতে পুনরাগমনের সময়। এই প্রত্যাশাটি ঈশ্বরের রাজ্যের সম্পর্কে বোঝার আলোক বর্তিকার মত। এই প্রত্যাশার মধ্যে দিয়ে এই গভীর উপলব্ধি আসে যে, এই বাস্তব পৃথিবীর উপরেই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে, ঠিক যেখানে মানুষের তৈরী পৃথিবীর ধ্বংস শুরু হয়েছে। আর এই স্বর্গরাজ্যের মধ্যে দিয়ে এমন এক সুখ-শান্তি অনন্তকালীন জীবন

শুরু হবে, যেখানে জীবন কখনই আর পাপ দ্বারা নষ্ট হবে না অথবা রোগ-ব্যাধি দ্বারা আতংকগ্রস্থ হবে না; অমরনশীল ও অপূর্ব আনন্দময় এক জীবন, যে জীবন এই পৃথিবীর উপরেই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে তাঁর সান্নিধ্যে কাটবে।

এই কথাটিও অত্যন্ত বিনয়ের সাথে স্বীকার করা প্রয়োজন যে, লেখক কখনই খ্রীষ্ট প্রভুর এই চুড়ান্ত আদেশটি সঠিকভাবে মান্য করার চেষ্টা করেন নাই যে, বাপ্তাইজিত হও। বাপ্তিস্ম সম্পর্কিত বাইবেল মতবাদের সম্পর্কে বোঝার পর এটাই প্রমানিত হয়েছে যে, লেখক শিশু অবস্থায় আগে যে "বাপ্তিস্ম" নিয়েছিলেন সেটি শাস্ত্রিয় শিক্ষা ও সঠিক আনুষ্ঠানিকতার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। লেখক নিজে যখন বাইবেল পড়ার মাধ্যমে বাপ্তিস্ম সম্পর্কে এর মুল মতবাদ বুঝতে পারার পর এটাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, লেখক শিশু অবস্থায় জল ছিটানোর মাধ্যমে যে "বাপ্তিস্ম" নিয়েছিলেন তা ছিল পবিত্র শাস্ত্রের শিক্ষা ও তার বাস্তব প্রয়োগের দৃষ্টিকোন বিচারে একেবারে অসঙ্গতিপূর্ণ। বাইবেল এবিষয়ে আসলে এই শিক্ষা দেয় যে, খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস -এর ফলশ্রুতিতে বাধ্যতার বহিঃপ্রকাশ হল বাপ্তিস্ম যা মূলত: প্রতিকীভাবে, পুরাতন জীবনে খ্রীষ্টের সাথে জলে কবরপ্রাপ্ত হওয়া বা মরে যাওয়া এবং আবার বাধ্যতার এক নতুন জীবনে পুনরুত্থিত হওয়া।

প্রাথমিক মণ্ডলীর দিনগুলিতে বহু খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের প্রতি ভয়ংকর অত্যাচারের সময়, তাদেরকে পাথর মারা হয়েছে, খেতে না দিয়ে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, শারিরীকভাবে মারা হয়েছে, নির্যাতন করবার জন্য খুজে বেড়ানো হয়েছে এবং একসময় হত্যা করা হয়েছে, তারা সাক্ষ্যমর হয়েছেন। তারা এত ভয়ংকর নির্যাতন সহ্য করতে পেরেছেন এই কারণে যে তারা যা বিশ্বাস করেছিলেন সেটাই চুড়ান্ত কারণ, একমাত্র এটাই জীবন রক্ষাকারী বিষয়। এজন্য পিতর দৃঢ়তার সাথে একথা বলতে পেরেছিলেন, *"মানুষদের চেয়ে বরং ঈশ্বরের আদেশ পালন করা বেশি ভালো"* (প্রেরিত ৫ঃ২৯)। এজন্য আমরা কি বিশ্বাস করি কিংবা কাদের সাথে উপাসনার সহভাগীতায় মিলিত হই -এটা যদি কোন ব্যাপার না হয়, তবে শিষ্যরা যে সবকিছুর বিনিময়ে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করে নিশ্চয় ভুল করেছিলেন।

## বিশ্বাসে জীবনযাপন করার তিনটি উদাহরণ

কিভাবে প্রেরিতরা তাদের জীবনাচরনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সত্যকে বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন সে বিষয়ে গভীরভাবে লক্ষ্য করা খুবই লাভজনক বিষয়। তবে এটি আমরা এরইমধ্যে "ঈশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত সত্য সম্পর্কে জানার গুরুত্ব" বিষয়ক রূপরেখায় আলোচনা করেছি। প্রেরিত ১০ অধ্যায়ে কর্ণেলিয়াস নামে একজন লোক সম্পর্কে বেশ সুন্দর একটি বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। বাইবেল বলে, এই লোকটি ছিলেন একজন উৎসর্গীকৃত লোক, তিনি তার সমস্ত পরিবারসহ ঈশ্বরের বাধ্যতায়-ভয়ে জীবনযাপন করতেন। সবসময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন ও গরীবদেরকে অনেক টাকা-পয়সা দিতেন (১০ঃ২)। ঈশ্বর পিতরকে এই লোকটি ও তার সাথে জড়িত অন্যদের কাছে খ্রীষ্ট ও তাঁর রাজ্য সম্পর্কে প্রচার করার জন্য পাঠালেন। কর্ণেলিয়াস ও পরিবারের সকলে পিতরের কথা শুনে ও যীশুতে বিশ্বাস করে জলে বাপ্তিস্ম নিলেন (১০ঃ৪৮)।

এটা এই জন্যই এত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরন যে, কর্ণেলিয়াস ছিলেন সবদিক দিয়ে অত্যন্ত ভালো মানুষ, ঈশ্বর ভয়কারী, প্রতিদিন নিয়মিত প্রার্থনাশীল এবং বিশ্বস্ত ও দয়ালু জীবনযাপনকারী একজন মানুষ। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও ঈশ্বরের প্রকৃত সত্য জানা এবং পরিত্রাণ পাবার জন্য তার প্রতি সাড়াদান করা তার জন্য একান্ত আবশ্যক ছিল। আজকের মূল্যবোধের মান অনুসারে অনেকেই হয়ত বলবেন, যেহেতু তিনি এত ভালো মানুষ সেহেতু এভাবেই তিনি সঠিক খ্রীষ্টিয়ান জীবনযাপন শুরু করতে পারেন, কিন্তু বাইবেলের ঐ পদ প্রমান করে যে, তিনি আসলে কি বিশ্বাস করেন সেটা বড় একটা ব্যাপার। তার সঠিক সত্য সম্পর্কে জানা আবশ্যক ছিল যেন সে বিষয়ে উপযুক্ত সাড়া প্রদান করতে পারেন।

প্রেরিত ৮ অধ্যায়ে আর একজন ব্যক্তির এবিষয়ে সুন্দর একটি উদাহরন আছে, যাকে আজকের মূল্যবোধের মান অনুসারে একজন ভালো বাইবেল অধ্যায়নকারী ও নিয়মিত মান্ডলীক উপাসনায় যোগদানকারী বলতে পারি। তিনি একজন ইথিয়পিয়ান। যিরুশালেম মন্দিরে উপাসনা করে নিজ দেশে ফিরছিলেন। যাত্রাপথে তার নিজ ঘোড়ার গাড়ীতে

বসে তিনি যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়টি পড়ছিলেন। ঈশ্বর একজন স্বর্গদূতকে ফিলিপ -এর কাছে পাঠালেন যেন ফিলিপ গিয়ে সেই ইথিয়পিয়ান লোকটি যা পড়ছিলেন তা বুঝতে সাহায্য করেন, ফলে ফিলিপ সেই লোকটির ঘোড়ার গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসলেন ও যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কিত সত্য তার কাছে প্রকাশ করলেন। যাত্রা পথে এগিয়ে যেতে যেতে পথে তারা একটি জলাশয়ের পাশে উপস্থিত হলেন। এসময়ে জলাশয় দেখে ইথিয়পিয় লোকটি ফিলিপের কাছে বাপ্তিস্ম নিতে চাইলেন। আর এভাবেই আর একটি বার প্রমান হল যে, পরিত্রাণ পাবার প্রক্রিয়ায় প্রকৃত বিশ্বাস গ্রহণ করার গুরুত্ব কতখানি।

তৃতীয় উদাহরণটি পাওয়া যায় "আপলোর" কাছ থেকে এভাবে- *"...তিনি জাতিতে আলেক্সান্দ্রীয়, একজন সুবক্তা ও শাস্ত্রে ক্ষমতাপন্ন ছিলেন"* (প্রেরিত ১৮ঃ২৪)। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, *"তিনি প্রভুর পথের বিষয়ে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, এবং আত্মাতে উত্তপ্ত হওয়াতে যীশুর বিষয়ে সূক্ষ্মরূপে কথা বলিতেন ও শিক্ষা দিতেন..."* (প্রেরিত ১৮ঃ২৫)। কিন্তু পরবর্তী আলোচনা এটা একেবারে স্পষ্টকরে বলে যে, তার আরও কিছু বিষয় গ্রহণ করবার দরকার ছিল। দুজন বিশেষ শিষ্য প্রিস্কিলা ও আক্কিলা, *"তাঁর উপদেশ শুনিয়া তাঁহাকে আপনাদের নিকটে আনিলেন, এবং ঈশ্বরের পথ আরও সূক্ষ্মরূপে বুঝাইয়া দিলেন"* (১৮ঃ২৬)। অর্থাৎ এটা অবশ্যই অত্যন্ত বড় ব্যাপার ছিল যেন আপলো একেবারে সঠিকভাবে ঈশ্বরের প্রকৃত সত্য সম্পর্কে জানতে পারেন।

## উপসংহার

সুতরাং সংক্ষেপে আমরা বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখি, প্রথমতঃ একজন বিশ্বস্ত ধার্মিক লোক যিনি প্রতিদিন প্রার্থনা করতেন ও বিশ্বস্ত জীবনযাপন করতেন; দ্বিতীয়ত: প্রতিদিন বাইবেল পড়েন এমন একজন ব্যক্তি যিনি অত্যন্ত মর্যাদার সাথে ঈশ্বরের উপাসনা করতেন; এবং তৃতীয়ত: "পবিত্র শাস্ত্রে পারদর্শী একজন ধর্ম প্রচারক যিনি সমাজ গৃহে আত্মিক উদ্দীপনায় ও অত্যন্ত সাহসের সংগে ধর্মকথা বলতেন- এই তিনজন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই একটি বিষয় সমানভাবে প্রযোজ্য যে, এই তিনজনকেই পবিত্র শাস্ত্র থেকে ঈশ্বরের প্রকৃত সত্য সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হয়েছিল। এই তিন ব্যক্তির বাস্তব ঘটনার উদাহরন গুলি কখনই এই ধারনাকে সমর্থন করে না যে, খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা যাই বিশ্বাস করুক না কেন সেটাই কি তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে ? আবার ভিন্নমত অনুসারে একথাটি স্পষ্টত: প্রমান হয় যে, যারা তাদের ধর্মকে বেঁচে থাকবার বা লাভের মাধ্যম হিসাবে দেখতে চায় তারা সবসময় এবিষয়ের উপরই জোর দান করে যে, তারা যাই বিশ্বাস করুক না কেন সেটা ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষার সাথে সংগতি পূর্ণ। আসলে পরিত্রাণকারী বিশ্বাস সবসময়ই যা প্রকৃত সত্য তার উপরই বিশ্বাস স্থাপন করে। অন্যদিকে মানবীয় ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে যে বিশ্বাস গড়ে ওঠে তা যীশুর সময় তেমনি অরাজকতার সৃষ্টি করত এখনও তেমনি করে।

## আমি কোন চার্চের সাথে সহভাগীতা রক্ষা করি সেটা কি কোন বিষয় ?

বাইবেলের পদ থেকেই আমরা দেখেছি যে, আমরা যা বিশ্বাস করি সেটা কোন বড় বিষয় কিনা। কিন্তু চুড়ান্ত বিশেষন দ্বারা আমরা এইসব প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারি। মুলত: প্রশ্নের ধরনের উপরই উত্তরের যথার্থতা নির্ভর করে। যদি প্রশ্নটি হয় এমন, ঐ চার্চের উপাসনার সহভাগীতা নিছক বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য কিংবা নিজের বিশ্বাসের বাহ্যিক আত্মতুষ্টি লাভের জন্য রক্ষা করা উচিত- তবে অবশ্যই তার উত্তর হবে, না, আমি কি বিশ্বাস করি সেটা বড় কোন বিষয় নয়। আবার উত্তরটি তখনই হ্যাঁ বাচক হবে যখন প্রশ্নটি হবে- ঐ চার্চের উপাসনার সহভাগীতা অনন্তজীবন লাভের জন্য কিনা কিংবা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হবার জন্য কিনা- তখন অবশ্যই বলতে হবে, আমি কি বিশ্বাস করছি সেটা অনেক বড় বিষয়।

**ডেনীস গিলেট**

*প্রকাশক -এর কথা: ডেনীস গিলেট একটি রোমান ক্যাথলিক চার্চে বড় হয়ে ওঠেন এবং একসময় চার্চের পালকীয় প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে তিনি সরাসরি বাইবেল পড়ার সুযোগ পান ও তার মনে হাজারো প্রশ্ন আসার সুযোগ সৃষ্টি হয়। সেমিনারীর শিক্ষকদের উত্তর তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এজন্য তিনি প্রচুর পরিমানে বাইবেল পড়তে শুরু করেন। অবশেষে একসময় ঈশ্বর ও সুসমাচার সম্পর্কে তার ধারনা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল, আর এরপর থেকে তিনি খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের প্রত্যাশা ও মৃত ব্যক্তিদের পুনরুত্থানের প্রত্যাশায় শান্তিতে ঘুমোতে যেতে পারতেন।*

## *প্রশ্নাবলী*

১। খ্রীষ্টের সময়ে লোকেরা শাস্ত্র বা বাইবেল পাঠ করত, তবে কেন খ্রীষ্ট যীশু তাদের ভর্ৎসনা করেছেন ? (যোহন ৫ঃ৩৯-৪০ পদ)

২। বিরয়ার যিহুদী লোকদের কি আদেশ দেওয়া হয়েছিল ? (প্রেরিত ১৭ঃ১১)

ক) পৌলের প্রচারিত শিক্ষা শুনত

খ) পৌল যা প্রচার করছিলেন ও শিক্ষা দিচ্ছিলেন তা সঠিক কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য প্রতিদিন শাস্ত্রে অনুসন্ধান করত

গ) নিয়মিত সহভাগিতায় সমবেত হত

৩। ঈশ্বরের সত্য জানবার একমাত্র উপায় ও মাধ্যম কি ?

ক) ঈশ্বর নিঃস্বাসিত সমস্ত শাস্ত্রলিপি থেকে

খ) ধর্মতত্ব বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত পালক এর মাধ্যমে

গ) একমাত্র নূতন নিয়ম পাঠের মাধ্যমে

৪। পরিত্রাণের জন্য প্রাথমিক ভাবে কোন দুটি বিষয় একান্ত জানা দরকার ? (মার্ক ১৬ঃ১৬)

৫। পৌল গালাতীয় ১ঃ৮ পদে কি বিষয়ে সতর্ক করেছেন ?

৬। আমরা যা বিশ্বাস করি তা কি খুব বড় বিষয় ?

৭। ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করতে হলে কি ধরনের মনোভাব থাকা প্রয়োজন ? (যিশাইয় ৬৬ঃ২)

**খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্**
পি ও বক্স নং৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত
পি ও বক্স নং১৭১১২, টালিগঞ্জ এইচ. ও., কলকাতা, ৭০০০৩৩, ভারত

**One Bible - Many Churches, Why?**
by Dennis Gillett
Translated by Dipok Das

*Published by:*

**Christadelphian Bible Students**
P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**
PO Box 17112, Tollygunge H.O., Kolkata – 700033, **India**

© Copyright Bible Text: BBS CL and OV (with permission)
*This booklet is translated and published with the kind permission of the Christadelphian Publishing Office, 404 Shaftmore Lane, Birmingham B28 8SZ*